জীবন ভাবনা–প্রথম অনুভূতি নতুন চিন্তা

কিশোর–কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালীন প্রজনন স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

আইইএম ইউনিট
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

UNFPA

জীবন ভাবনা-প্রথম অনুভূতি নতুন চিন্তা

কিশোর-কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালীন প্রজনন স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য

সূচীপত্র

	ভূমিকা	২
১.	**বয়ঃসন্ধিকাল ও কৈশোরে পরিবর্তনসমূহ**	৩
	বয়ঃসন্ধিকালের কিশোরীর শারীরিক পরিবর্তন	৩
	বয়ঃসন্ধিকালের কিশোরের শারীরিক পরিবর্তন	৪
	বয়ঃসন্ধিকালে মানসিক পরিবর্তন	৫
	বয়ঃসন্ধিকালে ঝুঁকি	৬
	বয়ঃসন্ধিকালে ঝুঁকির কারণ	৬
	ঝুঁকি প্রতিকারে করণীয়	৭
২.	**বয়ঃসন্ধিকালীন প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা**	৮
	মাসিক বা ঋতুস্রাব	৮
	স্বপ্নদোষ	৯
৩	**স্বাস্থ্য**	১০
	প্রজনন স্বাস্থ্য	১০
	বিশেষ যৌন ও প্রজনন অধিকারসমূহ	১১
৪	**প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও করণীয়**	১৩
	প্রজননতন্ত্রে সংক্রমণ ও যৌনরোগ হলে করণীয়	১৪
	এইচআইভি ও এইড্‌স	১৫
৫	**টিটি টিকা**	১৭
৬.	**জেন্ডার ধারণা**	১৮
	ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ	১৮
	বৈষম্যমূলক আচরণ দূর করতে করণীয়	২১
৭	**শিশু বিবাহ**	২২
	শিশু বিবাহের ঝুঁকিসমূহ	২২
	কম বয়সে গর্ভধারণের ঝুঁকি	২২
৮	**নিরাপদ মাতৃত্ব**	২৩
	গর্ভকালীন সেবা	২৩
	নিরাপদ প্রসবের জন্য পরিকল্পনা	২৪
	গর্ভকালীন পাঁচটি বিপদচিহ্ন	২৫
	প্রসব পরবর্তী যত্ন	২৬
৯	**প্রসবজনিত ফিস্টুলা**	২৭
	ফিস্টুলা প্রতিরোধের উপায়	২৭
১০	**পরিবার পরিকল্পনা**	২৮
	আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিসমূহ	২৯
	প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রসমূহ	৩০

ভূমিকা

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ কিশোর-কিশোরী। এই কিশোর-কিশোরীদের শিক্ষা, জীবন দক্ষতা ও স্বাস্থ্যের ওপর নির্ভর করছে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ। কৈশোরের শিক্ষা, জ্ঞান ও অভ্যাস তার পরবর্তী জীবনের উপর অনেক প্রভাব ফেলে। কাজেই বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলতে কিশোর-কিশোরীদের যেমন সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন, তেমনিভাবে মা, বাবা, পরিবার ও সমাজের সবাইকে তাদের সাহায্য সহযোগিতার জন্য এখনই এগিয়ে আসা জরুরি।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞা অনুযায়ী যাদের বয়স ১০-১৯ বছর, তাদের বলা হয় কিশোর-কিশোরী। আর এ সময়কালকে বয়ঃসন্ধিকাল বলে। বিডিএইচএস-২০১১ এর সমীক্ষা অনুযায়ী আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার ৩১%, ১০-২৪ বছর বয়সসীমার অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে ১২%, ১০-১৪ বছর, ১০%, ১৫-১৯ বছর এবং বাকি ৯%, ২০-২৪ বছর বয়সসীমার অন্তর্ভুক্ত। মোট জনসংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ তরুণ-তরুণী। সুতরাং এই প্রজন্মের সামগ্রিক কল্যাণ পরিকল্পনার মধ্যেই নিহিত রয়েছে আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের বীজ।

১. বয়ঃসন্ধিকাল ও কৈশোরে পরিবর্তনসমূহ

বয়ঃসন্ধিকাল ও কৈশোর প্রতিটি মানুষের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদের শরীর ও মনে নানা ধরনের পরিবর্তন হতে শুরু করে। সবার ক্ষেত্রে পরিবর্তনগুলো একই সময়ে একই রকম নাও হতে পারে, কিন্তু মনে রাখতে হবে এই পরিবর্তনগুলো অত্যন্ত স্বাভাবিক।

বয়ঃসন্ধিকালে কিশোরীর শারীরিক পরিবর্তন

বয়ঃসন্ধিকালে কিশোরীদের ক্ষেত্রে সাধারণত যেসব শারীরিক পরিবর্তন হয়, সেগুলো হলো-

- উচ্চতা ও ওজন বাড়ে।
- ঋতুস্রাব বা মাসিক শুরু হয়।
- বগল ও যৌনাঙ্গের উপরিভাগে লোম গজায়।
- স্তন বৃদ্ধি পায়, যৌনাঙ্গ বড় হয়।
- কোমর সরু হয়, উরু ও নিতম্ব ভারী হয়।
- জরায়ু ও ডিম্বাশয় বড় হয়।
- চামড়া তৈলাক্ত হয়।

বয়ঃসন্ধিকালে এইসব পরিবর্তন খুবই স্বাভাবিক। এই পরিবর্তনগুলো নিয়ে লজ্জা, সংকোচ বা দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই।

বয়ঃসন্ধিকাল ও কৈশোরে পরিবর্তনসমূহ

বয়ঃসন্ধিকালে কিশোরের শারীরিক পরিবর্তন

বয়ঃসন্ধিকালে কিশোরদের ক্ষেত্রে সাধারণত যেসব শারীরিক পরিবর্তন হয় সেগুলো হলো-

- উচ্চতা ও ওজন বাড়ে।
- লিঙ্গ ও অন্ডকোষ বড় হয়।
- বগল ও যৌনাঙ্গের উপরিভাগে লোম গজায়।
- দাড়ি গোঁফ গজায়, হাত পায়ের লোম গাঢ় হয়।
- বুকে লোম গজায়, বুক ও কাঁধ চওড়া হয়।
- কন্ঠস্বর পরিবর্তন হয়।
- বীর্য উৎপাদন ও স্বপ্নদোষ শুরু হয়।
- চামড়া তৈলাক্ত হয়।

বয়ঃসন্ধিকালে এইসব পরিবর্তন খুবই স্বাভাবিক। এই পরিবর্তনগুলো নিয়ে লজ্জা, সংকোচ বা দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই।

বয়ঃসন্ধিকালে মানসিক পরিবর্তন

বয়ঃসন্ধিকালে সাধারণত কিশোর-কিশোরীদের যেসব মানসিক পরিবর্তন দেখা যায় সেগুলো হলো-

- অজানা বিষয়ে জানার কৌতূহল বাড়ে, চলাফেরায় চঞ্চলতা বাড়ে।
- স্বাধীনভাবে চলতে ইচ্ছা হয়, কেউ কেউ নিজেকে আড়াল করে রাখতে ভালোবাসে।
- আবেগের দ্রুত পরিবর্তন দেখা দেয়। যেমন- কখনো মন চঞ্চল হয় আবার কখনোবা বিষণ্ন হয়, নানা ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতা কাজ করে।
- বিভিন্ন শারীরিক পরিবর্তনের কারণে অনেকের লাজুকভাব বেড়ে যায়।
- সৌন্দর্য সচেতনতা বাড়ে, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে, যৌন বিষয়ে চিন্তা আসে।
- পারস্পরিক সম্পর্ক নতুনভাবে তৈরি হয়।
- বন্ধু-বান্ধবের আচরণ অনুকরণ করে।
- পারিবারিক শাসন নিয়ে বিরোধ হয়।
- অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রবণতা বাড়ে।
- দিবাস্বপ্ন বা কল্পনাপ্রবণ হয়।

বয়ঃসন্ধিকাল ও কৈশোরে পরিবর্তনসমূহ

বয়ঃসন্ধিকালে ঝুঁকি

- অনেকেই ধূমপান ও মাদকাসক্তিসহ অন্যান্য অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িয়ে যেতে পারে।
- অবৈধ ও অনিরাপদ যৌনসম্পর্ক, ফলস্বরূপ অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভসঞ্চার, এইচআইভি/এইড্‌স ও অন্যান্য যৌনরোগ সংক্রমণ হতে পারে।
- অশ্লীল, অননুমোদিত ও অবৈজ্ঞানিক বই পুস্তক পড়ে ভুল তথ্য সংগ্রহ করে ভুল পথে পরিচালিত হতে পারে।
- বিপদজনক যান চালানোর ফলে দুর্ঘটনার শিকার হতে পারে।
- অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের ফলে মোটা হয়ে যেতে পারে। যেমন- ফাষ্টফুড। আবার সুষম খাবার না খাওয়ার কারণে রুগ্ন হয়ে যেতে পারে।

বয়ঃসন্ধিকালে ঝুঁকির কারণ

- কিশোর-কিশোরীরা প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য না জানার কারণে বা ভুল তথ্যের কারণে অনেক সময় ভুল পথে পরিচালিত হয়।
- অভিভাবক ও শিক্ষকগণ প্রজনন স্বাস্থ্য ও বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন বিষয়ে কিশোর-কিশোরীদের সাথে আলোচনা করতে সংকোচ বোধ করেন বিধায় তারা এ দুটি বিষয়ে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য উৎস হতে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে পারে না।
- রেডিও, টেলিভিশনসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার খুবই অপ্রতুল।
- স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে অবিবাহিতদের জন্য প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা ও পরামর্শ দেয়ার সুযোগ সীমিত। তাছাড়া কিশোর-কিশোরীরা এখানে তাদের প্রজনন স্বাস্থ্য সমস্যা বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না বিধায় নিজেদের সমস্যা গোপন রাখে।
- গর্ভসঞ্চার ও যৌনরোগের সংক্রমণ বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব।
- অযথা ঝুঁকি নেয়া ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার প্রবণতা।
- সমকক্ষ/সমবয়সিদের চাপ ও পরামর্শ।
- প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা ও সেবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে না পারা।

ঝুঁকি প্রতিকারে করণীয়

- কৈশোরে বন্ধু-বান্ধব থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু এ সময় নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা কাজে লাগিয়ে বুঝতে হবে কোন কাজটি ভাল এবং কোনটি ভাল নয়। বন্ধু-বান্ধবদের চাপে বা কৌতুহল বশবর্তী হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া উচিৎ নয়। ভাল-মন্দ বিচার-বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
- বাবা-মা, ভাই-বোন সকলের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন। মনে কোনো প্রশ্ন জাগলে কিংবা কোনো সমস্যায় পড়লে তাদের সাথে খোলামেলা আলোচনা করতে হবে এবং তাদের সাহায্য-সহযোগিতা চাইতে হবে।
- পড়াশোনা, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে নিজেকে বেশি নিয়োজিত রাখতে হবে, যাতে বিপদজনক বা অসামাজিক কাজ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা যায়।
- প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সঠিক তথ্য জেনে সেগুলো মেনে চলতে হবে।
- এসময় পুষ্টিকর ও সুষম খাবার খেতে হবে।
- মাদককে 'না' বলতে হবে।
- ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।
- ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুকাল। তাই, ১৮ বছর বয়সের আগে বিয়ে মানে শিশু বিবাহ। এটি মানবাধিকার লঙ্ঘন। তাই শিশু বিবাহ বন্ধ করতে হবে।
- পরিবার, সমাজ ও দেশের জন্য কাজ করার মানসিক প্রস্তুতি এই বয়স থেকেই নিতে হবে।
- কোন আত্মীয় অথবা পরিচিত/অপরিচিত ব্যক্তি দ্বারা কিশোর-কিশোরীরা যৌন নির্যাতনের শিকার হতে পারে। তাই বাবা-মাকে এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে।

আবেগতাড়িত না হয়ে জেনে বুঝে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কারণ বয়ঃসন্ধিকাল জীবন গড়ার সঠিক সময়।

২. বয়ঃসন্ধিকালীন প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীরা প্রজনন ক্ষমতা লাভ করে, তাই এই সময় থেকেই প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রয়োজন। অনেকে মনে করেন অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে জানার কোনো দরকার নেই। এ ধারণা সঠিক নয়, কারণ প্রজনন সক্ষম হবার সাথে সাথেই প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতে পারলে কিশোর-কিশোরীরা সঠিকভাবে নিজেদের যত্ন নিতে পারবে। তারা এ শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে সুস্থ-সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারবে ও ভুল পথে পরিচালিত হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে।

মাসিক বা ঋতুস্রাব

- মেয়েদের ৯ থেকে ১৩ বছর বয়সে যে কোনো সময় মাসিক শুরু হয় এবং ৪৫ থেকে ৪৯ বছর বয়স পর্যন্ত তা থাকে।
- মাসিক মেয়েদের একটি স্বাভাবিক শারীরিক প্রক্রিয়া। স্বাভাবিক নিয়মে প্রতি মাসিকের মাঝামাঝি সময়ে একটি করে ডিম্বাণু পরিপক্ক হয়। পরিপক্ক ডিম্বাণুটি নিষিক্ত না হলে মাসিকের রক্তের সাথে বেরিয়ে আসে।
- এটি একজন কিশোরীর প্রজননতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশের পরিচায়ক।
- জীবনে প্রথম মাসিক হবার আগেই পরিপক্ক ডিম্বাণু যদি শুক্রাণুর সাথে মিলিত হয়, তবে গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং প্রথম মাসিক হবার আগে যৌনমিলন হলেও পেটে বাচ্চা আসতে পারে। তাই কিশোরীদের সঠিক তথ্য জানতে হবে এবং সেভাবে নিজেকে অনাকাঙ্খিত ঘটনা হতে মুক্ত রাখতে হবে।
- মাসিকের সময় পরিষ্কার কাপড়/স্যানিটারী প্যাড ব্যবহার করতে হবে। যদি কাপড় ব্যবহার করা হয় তবে তা পুনরায় ব্যবহারের আগে অবশ্যই সাবান দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে কড়া রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। একটি প্যাড মাত্র একবারই ব্যবহার করা স্বাস্থ্যসম্মত।
- অপরিচ্ছন্ন নোংরা কাপড়/স্যানিটারী প্যাড ব্যবহারের কারণে প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ হতে পারে, যা শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

বয়ঃসন্ধিকালে মাসিক একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। সুতরাং এটি নিয়ে ভয় ও সংকোচের কোনো কারণ নেই।

স্বপ্নদোষ

- একটি ছেলে যখন ১২-১৩ বছর বয়সে পৌঁছায়, তখন তার বীর্য (ধাতু) তৈরি হতে শুরু করে। বীর্য যখন ঘুমের মধ্যে বেরিয়ে আসে, তখন তাকে স্বপ্নদোষ বলে। এটি কোনো রোগ বা দোষ নয় তাই এর কোনো চিকিৎসার দরকার নেই। কোনো কোনো সময় যৌনবিষয়ক চিন্তা বা স্বপ্নের সাথে স্বপ্নদোষ হওয়ার সম্পর্ক থাকে।
- এটি একজন কিশোরের প্রজননতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশের পরিচায়ক।
- কিশোরদের স্বপ্নদোষ হলে অবশ্যই সেই কাপড় ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হবে।
- অপরিষ্কার প্যান্ট, লুঙ্গি বা কাপড় পরার কারণে নানা ধরনের চুলকানি ও সংক্রমণ হতে পারে।

বয়ঃসন্ধিকালে স্বপ্নদোষ একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। স্বপ্নদোষ শারীরিক কোনো অসুবিধা করে না, শরীরকে দুর্বলও করে না। সুতরাং এটি নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানতে হবে। তাহলেই সুস্থ জীবন গড়ে উঠবে। ভুলপথে যাওয়ার ঝুঁকি থাকবে না।

৩. স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্য বলতে পরিপূর্ণ দৈহিক, মানসিক এবং সামাজিক কল্যাণকর একটি অবস্থা বোঝায় যেখানে কোনো রোগ বা দুর্বলতা উপস্থিত থাকে না।

প্রজনন স্বাস্থ্য

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (World Health Organization) মতে, প্রজনন স্বাস্থ্য কেবলমাত্র একটি সুস্থ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক অবস্থা এবং প্রজনন ও প্রক্রিয়া সংক্রান্ত কোন রোগ বা দুর্বলতার অনুপস্থিতি নয়। এগুলির পাশাপাশি পরিপূর্ণ ও সন্তোষজনক যৌনজীবন, প্রজনন ক্ষমতা ও প্রজনন স্বাধীনতার সমন্বয় হল প্রজনন স্বাস্থ্য। এর সাথে পুরুষ ও নারীর অধিকার, নিরাপত্তা এবং কার্যকর ও গ্রহণযোগ্য পরিবার পরিকল্পনা জড়িত। অতএব, প্রজনন স্বাস্থ্য কেবলমাত্র যৌন সংক্রমিত বা প্রজনন সম্পর্কিত রোগের জন্য পরামর্শ বা সেবা প্রদান নয়।

প্রজনন স্বাস্থ্যের উপাদান বা আওতাভূক্ত বিষয়সমূহ হলো-

- কৈশোর বয়সের প্রজনন স্বাস্থ্য।
- নিরাপদ মাতৃত্ব।
- নবজাতকের যত্ন।
- যৌনস্বাস্থ্য ও প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ।
- পরিবার কল্যাণ ও পরিকল্পনা।
- অনিরাপদ গর্ভপাত।
- বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসা ও সেবা, ইত্যাদি।

তালিকায় উল্লিখিত সাতটি বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো বয়ঃসন্ধিকালের প্রজনন স্বাস্থ্য। কারণ, এই বয়সের প্রজনন স্বাস্থ্যের বিকাশ এবং সুস্থতার উপর সমগ্র জীবনের সুস্থতা ও স্বাস্থ্যগত উন্নয়ন নির্ভর করে। ১৯৯৪ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশসহ ১৮২টি দেশ প্রজনন স্বাস্থ্যের যে বিষয়গুলোর উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে একমত প্রকাশ করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

- সবার জন্য প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
- কিশোর-কিশোরী ও যুব সম্প্রদায়ের মাঝে দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি এবং প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষায় তাদের উৎসাহিত করা।

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকারসমূহ

- সর্বোচ্চ ভাল মানের নিরাপদ প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার অধিকার; প্রত্যেক সেবাগ্রহীতার মানসম্মত ও নিরবিচ্ছিন্ন সেবা পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

স্বাস্থ্য

- জীবন ও বেঁচে থাকার অধিকার; অর্থাৎ মাতৃত্বজনিত জটিলতার কারণে কোনো মহিলার জীবন ঝুঁকিপূর্ণ না করা।
- স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার।
- যেকোনো প্রকার শারীরিক অত্যাচার, ক্রোধ, অমানবিক ও অসম্মানজনক আচরণ থেকে মুক্ত থাকার অধিকার।
- সন্তান গ্রহণ করা বা না করা এবং করলে তার সময় ও সংখ্যা নির্ধারণ এবং সেটা কিভাবে করা হবে তা স্বাধীনভাবে ও দায়িত্বশীলতার সাথে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার।
- যেকোনো ধরনের ভয়, ভীতি, বৈষম্য বা নির্যাতন মুক্ত থেকে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসহ যৌনতা সংক্রান্ত বিষয়ে মহিলাদের নিজেদের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকার ও স্বাধীনভাবে দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার।
- বিয়ের সময় পুরুষের মতো নারীদেরও স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার।
- বৈজ্ঞানিক অগ্রযাত্রায় ও তার প্রয়োগের সুযোগ নেয়ার অধিকার এবং এক্ষেত্রে কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হলে তাতে নারীর পূর্ণ সম্মতি গ্রহণের অধিকার।
- গোপনীয়তার অধিকার; অর্থাৎ সকল প্রকার প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে গোপনীয়তা রক্ষা করা এবং সকল মহিলার পছন্দসই প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া।
- অংশগ্রহণের অধিকার; অর্থাৎ প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের এবং নীতি নির্ধারকদের এ বিষয়ে প্রভাবিত করার অধিকার।
- বৈষম্য থেকে মুক্ত থাকার অধিকার; যৌন, লিঙ্গ, বৈবাহিক অবস্থা, বয়স, ধর্ম, বর্ণ, স্বাস্থ্যগত অবস্থা/বিকলঙ্গতা ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে যেন কোনো বৈষম্য না হয়।
- তথ্য ও শিক্ষার অধিকার; অর্থাৎ প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সঠিক তথ্য ও শিক্ষা পাওয়া এবং ব্যক্তি ও পরিবারের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা।
- সেবা প্রদানকারীর নিকট থেকে মর্যাদাপূর্ণ ও দায়িত্বশীল ব্যবহার পাওয়ার অধিকার।
- নির্যাতন থেকে মুক্ত থাকার অধিকার; অর্থাৎ নারী ও শিশু নির্যাতন, ধর্ষণ, হয়রানি ও এ সংক্রান্ত অন্যান্য সকল নির্যাতন থেকে মুক্ত থাকার অধিকার।

প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ক তথ্য ও সেবা পাওয়া সকল কিশোর-কিশোরীদের অধিকার।

* তথ্যসূত্র: Cook, R J, Dickens, B M, Fathalla, M F. Reproductive Health and Human Rights: Integrating Medicine, Ethics and Law. Oxford: Oxford University Press, 2003.

৪. প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও করণীয়

অনেক সময় জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হয়ে নারী ও পুরুষের প্রজননতন্ত্রে নানা ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি হয়। এসকল সংক্রমণের মধ্যে রয়েছে যৌনরোগ ও অন্যান্য সংক্রমণ। যৌনমিলনের মাধ্যমে যেসকল রোগ ছড়ায় তাকে যৌনবাহিত রোগ (STI) বলে। যেমন- সিফিলিস, গনোরিয়া, ক্ল্যামাইডিয়া, যৌনাঙ্গে ফুসকুড়ি, ট্রাইকোমোনিয়াসিস, হারপিস জেনিটালিয়া, এইচআইভি ও এইডস্ এবং হেপাটাইটিস বি, সি ইত্যাদি। এছাড়া অন্যান্যভাবেও প্রজননতন্ত্রে প্রদাহ হতে পারে। তবে হেপাটাইটিস এবং এইচআইভি/এইডস সহ কিছু যৌনরোগ যৌনমিলন ছাড়া অন্যভাবেও সংক্রমিত হতে পারে। যেমন- আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ, তার ব্যবহৃত সুঁচ বা সিরিঞ্জ ব্যবহারের মাধ্যমে এবং আক্রান্ত মা থেকে সন্তানের মাঝে ছড়াতে পারে। যৌনরোগ ছাড়াও অন্যান্য সংক্রমণ মাসিকের সময় অপরিষ্কার কাপড় ব্যবহার করলে এবং প্রসব বা গর্ভপাতের সময় নিরাপদ ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে হতে পারে।

পুরুষের ক্ষেত্রে সংক্রমণের লক্ষণ-

- প্রস্রাবের রাস্তায় পুঁজ, পুরুষাঙ্গে ঘা বা ক্ষত, অন্ডকোষ ফুলে যাওয়া ও ব্যথা, ঘনঘন প্রস্রাব, প্রস্রাবে জ্বালা পোড়া এবং ব্যথা, কুচকি ফুলে যাওয়া, কোনো কোনো ক্ষেত্রে জ্বর।

নারীদের ক্ষেত্রে সংক্রমণের লক্ষণ-

- যোনিপথে দূর্গন্ধযুক্ত স্রাব, যৌনাঙ্গে ক্ষত বা ঘা, যোনিপথে চুলকানি ও জ্বালাপোড়া, তলপেটে খুব ব্যথা, কুচকি ফুলে যাওয়া ও ব্যথা, সহবাসের সময় ব্যথা, কোনো কোনো ক্ষেত্রে জ্বর।

প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও করণীয়

সঠিক সময়ে প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও যৌনরোগের চিকিৎসা না করালে পরবর্তীতে যেসকল জটিলতা দেখা দিতে পারে সেগুলো হলো-

- নারী ও পুরুষ উভয়েরই সন্তান জন্মদান ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে।
- সন্তান নষ্ট হবার ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে।
- মৃত সন্তান জন্ম দেবার সম্ভাবনা থাকে।
- জরায়ুর মুখে ক্যান্সার হতে পারে।
- আক্রান্ত পুরুষের মূত্রনালী সরু হয়ে যেতে পারে।
- নারী ও পুরুষের যৌন ক্ষমতা কমে যেতে পারে।

প্রজননতন্ত্রে সংক্রমণ ও যৌনরোগ হলে করণীয়

- লজ্জা না করে তাড়াতাড়ি নিকটস্থ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও জেলা সদর হাসপাতাল থেকে পরামর্শ ও সেবা নিতে হবে।
- চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী পূর্ণ মেয়াদে ওষুধ খেতে হবে এবং অন্যান্য বিধি নিষেধ মেনে চলতে হবে।
- পরবর্তীতে যেন এই ধরনের রোগ আর না হয় সে বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে।

বয়ঃসন্ধিকাল জীবন গঠনের উপযুক্ত সময়, তাই এসময় থেকেই প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে শিক্ষা নেয়া প্রয়োজন।

এইচআইভি ও এইড্‌স

এইচআইভি (HIV) হলো মানুষের রোগ প্রতিরোধহানিকর ভাইরাস। এ ভাইরাস মানবদেহের রক্তে প্রবেশের পর ধীরে ধীরে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। এক সময় শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একেবারেই থাকেনা। এসময় বিভিন্ন রোগ যেমন- ডায়রিয়া, যক্ষ্মা, কলেরা ইত্যাদি মানব দেহকে আক্রমণ করলে মানব দেহে তার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে না। ফলে যে কোনো রোগ হলে আর ভালো হয় না। শরীরের এই অবস্থার নাম এইড্‌স। ২-১০ বছর পর্যন্ত এইচআইভি (HIV) মানবদেহে সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে। মৃত্যুই হলো এইড্‌স-এর করুণ পরিণতি।

এইচআইভি কিভাবে ছড়ায়

- এইচআইভি সংক্রমিত কারো সাথে অনিরাপদভাবে যেকোনো ধরনের যৌন মিলন করলে। ৮৫% সংক্রমণ এভাবেই ঘটে।
- এইচআইভি সংক্রমিত কারো রক্ত বা রক্তজাত পদার্থ অন্য কারো শরীরে সঞ্চালন করা হলে।
- সংক্রমিত ব্যক্তির ব্যবহৃত সুঁচ, সিরিঞ্জ জীবাণুমুক্ত না করে অন্য কারো শরীরে ব্যবহার করলে।
- শল্য চিকিৎসায় ব্যবহৃত সংক্রমিত যন্ত্রপাতির মাধ্যমে।
- মা থেকে সন্তানের মাঝে। সংক্রমিত মা থেকে গর্ভধারণকালে, সন্তান প্রসবকালে কিংবা মাতৃদুগ্ধ পান করা সন্তানদের মাঝে সংক্রমণ ছড়াতে পারে।

জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ ও করণীয়

এইচআইভি কিভাবে ছড়ায় না

- হাঁচি, কাশি, কফ, থুথু, বা শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে।
- একসাথে এক ঘরে বসবাস করলে বা এক বিছানায় ঘুমালে।
- একসাথে বা একই থালা-বাসনে খাওয়া দাওয়া করলে।
- একসাথে খেলাধুলা বা একই স্কুলে পড়াশুনা করলে।
- মশা বা কোনো পোকা-মাকড়ের কামড়ে।
- আক্রান্ত ব্যক্তির কাপড় ব্যবহার করলে, হাত মেলালে বা কোলাকুলি করলে।
- একই বাথরুম ব্যবহার করলে বা একই পুকুরে গোসল করলে এইচআইভি ছড়ায় না।

এইচআইভি ও এইড্স প্রতিরোধে করণীয়

এইড্স-এর চিকিৎসা এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। তাই এইচআইভি থেকে রক্ষা পাবার শ্রেষ্ঠ উপায় হলো প্রতিরোধ করা। যেমন-

- স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা।
- ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা। যেমন- বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর বাইরে কোনো ধরনের শারীরিক সম্পর্ক না করা এবং বিবাহপূর্ব শারীরিক সম্পর্ক না করা।
- আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে যৌনমিলনের সময় সঠিকভাবে কনডম ব্যবহার করা।
- ডিসপোজেবল্ সিরিঞ্জ ব্যবহার করা।
- রক্ত গ্রহণের আগে অবশ্যই পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়া যে তা এইচআইভি মুক্ত।
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি দিয়ে অস্ত্রোপচার করা।
- যৌনরোগের লক্ষণ দেখা গেলেই দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া এবং সে অনুযায়ী পূর্ণ মেয়াদে চিকিৎসা গ্রহণ করা।

সচেতনতাই এইচআইভি এইড্স থেকে বাঁচাতে পারে। তাই কিশোর-কিশোরীদের এইচআইভি এইড্স প্রতিরোধে সঠিক তথ্য জানতে হবে।

টিটি টিকার গুরুত্ব ও সময়সূচি

সারাজীবনে একজন নারীকে নূন্যতম ৫ ডোজ টিটি টিকা নিতে হয়। সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি অনুযায়ী ১৫ বছর বয়স থেকে টিকা দেয়া শুরু করতে হয় এবং সে অনুযায়ী মোট ৫ ডোজ টিটি টিকা নিতে হয়। পুরো ডোজ শেষ করতে মোট ২ বছর ৭ মাস সময় লাগে। ৫টি ডোজ টিকা সঠিক সময়ে নেয়া হলে মা ও শিশু সারাজীবন ধনুষ্টংকার থেকে রক্ষা পাবে।

একটি মেয়ের বয়স ১৫ বছর পূর্ণ হবার পরই টিটি টিকার ১ম ডোজ নিতে পারবে। ১ম ডোজ দেবার ৪ সপ্তাহ পর ২য় ডোজ নিতে হবে। ২য় ডোজ দেবার ৬ মাস পর ৩য় ডোজ নিতে হবে। ৩য় ডোজ দেবার ১ বছর পর ৪র্থ ডোজ নিতে হবে। ৪র্থ ডোজের ১ বছর পর ৫ম ডোজটি নিতে হবে।

যে সকল গর্ভবতী মা আগে কখনো টিটি টিকা নেয়নি তাকে পাশের ছক অনুযায়ী ১ম ডোজ টিটি টিকা নিতে হবে গর্ভধারণের ৪র্থ মাসে। ২য় ডোজ নিতে হবে তার ৪ সপ্তাহ পর। ৩য় ডোজ নিতে হবে ২য় ডোজের ৬ মাস পর অথবা পরবর্তী গর্ভধারণের সময়। ৪র্থ ডোজ নিতে হবে ৩য় ডোজের ১ বছর পর অথবা পরবর্তী গর্ভধারণের সময়। ৫ম ডোজটি ৪র্থ ডোজের ১ বছর পর অথবা পরবর্তী গর্ভধারণের সময় নিতে হবে। এভাবে ৫ ডোজ টিকা সঠিক সময়ে নেয়া হলে মা ও শিশু সারাজীবন ধনুষ্টংকার থেকে রক্ষা পাবে।

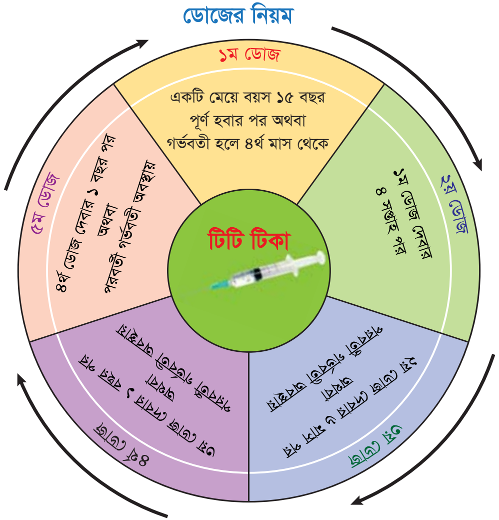

(প্রসবের সময়ের সাথে টিকাদান সময়সূচির কোনো পরিবর্তন হবে না)

ধনুষ্টংকার একটি মারাত্মক রোগ। এ থেকে রক্ষা পেতে সব নারীকে ৫ ডোজ টিটি টিকা সঠিক সময়ে নিতে হবে।

৬. জেন্ডার ধারণা

ছেলে ও মেয়েশিশু উভয়েই সমান সম্ভাবনা নিয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এবং তারা সব ধরনের কাজই করতে পারে। শুধুমাত্র শারীরিক কিছু পার্থক্য ছাড়া ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য থাকেনা। শারীরিক এই পার্থক্যের কারণে মেয়েরা সন্তান জন্ম দিতে পারে, অন্য দিকে ছেলেরা ভ্রুণ উৎপাদনে ভূমিকা রাখে। প্রকৃতিগত এই পার্থক্যকে ভিত্তি করে সমাজ ছেলে আর মেয়ের ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। ছেলে-মেয়ের উপর সামাজিকভাবে আরোপিত এই পরিচয় ও ভূমিকাকেই **জেন্ডার বলে**।

বহুদিন ধরে মেয়েরা রান্না, ঘরের কাজ, সন্তান লালন-পালন এইসব গৃহস্থালী কাজ করে আসছে, অন্যদিকে ছেলেরা আয়-উপার্জন, বিচার শালিস, রাজনীতি ইত্যাদি কাজ করতো। এই পার্থক্যের ফলে মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে। সৃষ্টি হয়েছে নানা ধরনের বৈষম্যমূলক সামাজিক ভূমিকা ও আচার আচরণ। তবে বর্তমানে মেয়েরা শিক্ষা, রাজনীতি এবং আয় উপার্জন মূলক কর্মকান্ডে ধীরে ধীরে অংশগ্রহণ করছে। সুতরাং জেন্ডার ভূমিকা পরিবর্তনযোগ্য।

ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ

আমাদের দেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছেলে এবং মেয়েকে সমান চোখে দেখা হয়না, সমান সুযোগ ও সমান অধিকার দেয়া হয় না। মেয়ে শিশুদের প্রতি অযত্ন আর অবহেলা প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষা, পুষ্টি, চিকিৎসা সব ক্ষেত্রেই অবহেলার শিকার হয় মেয়েরা। ফলে সমান সম্ভাবনা থাকার পরও একটি মেয়ে একটি ছেলের মত একইভাবে দক্ষ হয়ে বেড়ে উঠতে না পেরে পদে পদে পিছিয়ে পড়ে। অথচ যথাযথ সুযোগ পেলে উভয়ই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আয় উপার্জন করতে পারে। পরিবার ও সমাজে ভূমিকা রাখতে পারে।

আমাদের সমাজে সাধারণত মেয়ে আর ছেলের মধ্যে যে বৈষম্য করা হয় সেগুলো হলো-

পুষ্টিঃ বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদের শরীর দ্রুত বাড়ে তাই এ সময়ে উভয়েরই প্রচুর আমিষ ও ভিটামিনযুক্ত খাবার প্রয়োজন। তবে আমাদের পরিবারগুলোতে প্রায়ই দেখা যায়, তারা ছেলেকে বেশি খাবার দেয়, কিন্তু মেয়ের পর্যাপ্ত খাবারের ব্যাপারে উদাসীন থাকে, ফলে মেয়েটি অপুষ্টিতে ভুগে। শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে বেড়ে ওঠে। অথচ ভবিষ্যতের মা হিসেবে কিশোরীর জন্য পুষ্টি নিশ্চিত করা অনেক বেশি জরুরি।

শিক্ষাঃ পরিবারে একটি মেয়ে যখন বড় হয়ে ওঠে তখন ধরে নেয়া হয় সে বিয়ের জন্য উপযুক্ত হয়েছে, সুতরাং তার আর লেখাপড়ার দরকার নেই। এছাড়াও রাস্তাঘাটে মেয়েদের নিরাপত্তার অভাবে অনেক সময় স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয়া হয়। ফলে জীবন গঠনে বা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে একটি মেয়ে ছেলেদের চাইতে বরাবরই পিছিয়ে পড়ে। মেয়েরা শিক্ষার সুযোগ পেলে, সে উপার্জন করার সুযোগ পাবে এবং তাহলেই ভবিষ্যতে ছেলে সন্তানের মত পরিবার ও বাবা-মার দায়িত্ব নিতে পারবে।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাঃ স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রেও মেয়েরা কখনো কখনো অবহেলার শিকার হয়ে থাকে। এমনকি গর্ভাবস্থায়ও তার সঠিক যত্ন নেয়া হয় না। এর ফলে মাতৃমৃত্যু এবং শিশুমৃত্যুর ঝুঁকি বেড়ে যায়।

মর্যাদাবোধ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণঃ অনেক সময় ছোটবেলা থেকেই একটি মেয়েকে পরিবারে খাটো করে দেখা হয়, ভাল কাজের স্বীকৃতি দেয়া হয় না এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও তাকে অবহেলা করা হয়। এভাবে মর্যাদাহীনভাবে বেড়ে উঠতে উঠতে মেয়েরা মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং কখনো কখনো নিজের মর্যাদা বা অধিকারও বুঝতে পারে না।

মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাঃ ছোট বড় কোনো ধরনের কাজেই মেয়েদের মতামতের কোনো মূল্য অনেক পরিবারের সদস্যরা দেয় না। যেমন -মেয়ের অমতে বিয়ে দেয়া, অল্প বয়সে বিয়ে দেয়া, লেখাপড়া বন্ধ করে দেয়া, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে মিশতে না দেয়া, খেলাধুলা করতে না দেয়া ইত্যাদি।

সম্পদ বন্টনঃ আমাদের দেশে কেনো কোনো ক্ষেত্রে পরিবারে মেয়েরা তার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। দেখা যায় পরিবারের মহিলা সদস্যরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে অসচেতনতার কারণে ধরে নেন সম্পত্তিতে শুধুমাত্র ছেলেদেরই অধিকার রয়েছে। ফলে ধীরে ধীরে পারিবারিক ও সামাজিক চাপে মেয়েদের এটা মেনে নিতে হয়।

কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যঃ কাজের ক্ষেত্রে নারী পুরুষ উভয়েরই সমান অধিকার রয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে এই অধিকার কখনো কখনো লঙ্ঘিত হচ্ছে। দেখা যায় একটি ছেলে আর একটি মেয়ে একই কাজ করছে কিন্তু তাদেরকে পারিশ্রমিক একই রকম দেয়া হচ্ছে না। মেয়েরা যখন গর্ভবতী হচ্ছে তখন অনেক ক্ষেত্রে তাকে তার প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা দেয়া হচ্ছে না। এমন কি কখনো কখনো মেয়েটি চাকরি হারাচ্ছে। মনে রাখতে হবে কর্মসংস্থান সকল মানুষের মৌলিক অধিকার।

প্রজনন অধিকারঃ নারী ও পুরুষের প্রজনন অধিকার সমূহ হচ্ছে- উপযুক্ত বয়সে বিয়ের অধিকার, কখন এবং কয়টি সন্তান নিতে চান সে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার এবং প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য ও সেবা পাওয়ার অধিকার। অথচ আমাদের দেশের মেয়েরা প্রায়ই প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য ও সেবা পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

বৈষম্যমূলক আচরণ দূর করতে করণীয়

- কিশোর-কিশোরী উভয়কেই 'ছেলে ও মেয়ের সমান সুযোগ পাওয়ার অধিকার রয়েছে' এই বিষয়টিকে উপলব্ধি করতে হবে।
- অভিভাবকদেরকে বোঝাতে হবে যে, একজন মেয়েও সুযোগ পেলে ছেলের মতো প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এক্ষেত্রে মা-বাবার মতামতের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল হয়ে তাদের সাহায্য-সহযোগিতা চাইতে হবে।
- সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী একজন কিশোরীকে লেখাপড়া শিখে নিজেকে তৈরি করতে হবে। যাতে ভবিষ্যতে একজন পুরুষের পাশাপাশি তারাও মাথা উঁচু করে চলতে পারে।
- পরিবারের নারী সদস্যদের প্রতি কিশোরদের শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। একজন কিশোরকে লক্ষ্য রাখতে হবে বাড়িতে কোনো কিশোরী বোন বা আত্মীয়া থাকলে সে যেন তার মতোই খাবার, শিক্ষা, চিকিৎসা, মতামত দেয়ার স্বাধীনতা, মানমর্যাদা ইত্যাদি পায়।
- রাস্তাঘাটে কিশোরীদের উত্যক্ত করা, বাজে মন্তব্য বা ইভটিজিং/টিটকিরি করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- ছেলে ও মেয়ের সমান সুযোগ পাওয়ার যে অধিকার রয়েছে তা পিতা-মাতা, অভিভাবক, শিক্ষক এবং সমাজের সকলকে বুঝতে হবে এবং ছেলে-মেয়েদেরকে সমান সুযোগ দিতে হবে।

ছেলে ও মেয়ের সব ক্ষেত্রে সমান সুযোগ পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

৭. শিশু বিবাহ

বিয়ে একটি সামাজিক ও ধর্মীয় বন্ধন, যার মাধ্যমে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে ও একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ে একসাথে নতুন জীবন শুরু করে। সমাজের কিছু আইন কানুন এবং নিয়মনীতি মেনে বিয়ে করতে হয়। ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুকাল। তাই ১৮ বছর পূর্ণ হবার আগে কোনো বিয়ে হলে তাকে শিশু বিবাহ বলে। বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী বিয়ের জন্য **মেয়ের বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর** এবং **ছেলের বয়স কমপক্ষে ২১ বছর** হতে হবে। শিশু বিবাহ আমাদের দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী দন্ডনীয় অপরাধ।

শিশু বিবাহের ঝুঁকিসমূহ

- অল্প বয়সে গর্ভধারণের ঝুঁকি থাকে। ১৮ বছরের আগে বিয়ে হলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিয়ের ১ বছরের মধ্যে কিশোরী মেয়ে গর্ভধারণ করে ও সন্তান জন্ম দেয়। একটি মেয়ের শরীর ২০ বছর বয়সের আগে গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মদানের জন্য উপযুক্ত হয় না। তাই ২০ বছর বয়সের আগে গর্ভধারণ একটি কিশোরী মায়ের জীবন ও তার সন্তানের জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।
- কম বয়সে গর্ভধারণ করলে মা ও শিশু উভয়ই অপুষ্টিতে ভোগে।
- মাতৃমৃত্যু এবং শিশুমৃত্যুর হার বেড়ে যায়।
- অপরিপক্ক ও কম ওজনের শিশু জন্মের সম্ভাবনা বেড়ে যায়।
- মায়ের স্বাস্থ্যহানী হয় এবং প্রসবজনিত ফিষ্টুলা হবার ঝুঁকি থাকে।
- বয়স কম থাকার কারণে একটি মেয়ে সংসারের দায়িত্ব নেয়ার মতো উপযুক্ত হয় না। সে দায়িত্ব নিতে পারে না, ফলে তার উপর নির্যাতনের ঝুঁকি বেড়ে যায়।
- ছেলে ও মেয়ের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ হতে পারে।
- শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হতে পারে।
- সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতা কমে যায়।
- দেশ গুনগত মানসম্পন্ন জনসম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়।

১৮ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুকাল। তাই ১৮ বছর বয়সের আগে বিয়ে নয়, ২০ বছর বয়সের আগে গর্ভধারণ নয়।

"নিরাপদ মাতৃত্ব" হলো গর্ভবতী হওয়ার সময় থেকে প্রসবের পরবর্তী ৬ সপ্তাহ পর্যন্ত মায়ের জীবনকে নিরাপদ রাখার জন্য স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা।

নিরাপদ মাতৃত্বের জন্য যে সকল সেবার প্রয়োজন

১. গর্ভকালীন সেবা

গর্ভবতী হওয়া থেকে প্রসব-পূর্ববর্তী সময়কে গর্ভকালীন সময় বলে। এসময় যে সকল সেবার প্রয়োজন-

- গর্ভকালীন সময়ে **কমপক্ষে চারবার** স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে প্রসবপূর্ব স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা।
- বেশি পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার খাওয়া, স্বাভাবিকের চেয়ে প্রতিবারে কমপক্ষে দুমুঠো বেশি খাওয়া।
- গর্ভাবস্থায় পর্যাপ্ত বিশ্রাম প্রয়োজন, দিনের বেলায় কমপক্ষে দু-ঘন্টা বিশ্রাম নেয়া।
- পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা ও ভারি কাজ না করা।
- মানসিক ভাবে শান্তিতে থাকা।

"নিরাপদ মাতৃত্ব"- নারীর অধিকার

গর্ভকালীন পাঁচটি বিপদচিহ্ন

গর্ভকালীন সময়ে কিছু চিহ্ন দেখা দিতে পারে যেগুলো খুবই বিপদজনক। যেকোনো বিপদচিহ্ন দেখা দেয়া মাত্র দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে মা ও শিশু উভয়ের জীবন বিপন্ন হতে পারে।

গর্ভ, প্রসব ও প্রসব-পরবর্তী ৫টি বিপদচিহ্ন

১. খিঁচুনি

২. বিলম্বিত প্রসব

৩. ভীষণ জ্বর

৪. মাথা ব্যথা, ঝাপসা দেখা ও হাতে পায়ে পানি আসা

৫. রক্তস্রাব

গর্ভকালীন সময়ে উল্লিখিত যেকোনো একটি সমস্যা দেখা দিলে দ্রুত মাকে কাছের হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে।

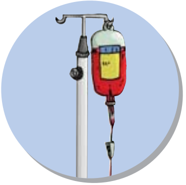

২. নিরাপদ প্রসবের জন্য পরিকল্পনা

প্রসবের সময় মা ও শিশুর জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ নানা জটিলতা দেখা দিতে পারে, তাই মা ও শিশুর জীবনের ঝুঁকি এড়াতে নিরাপদ প্রসব পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ।

- স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা ক্লিনিকে প্রসব করানোই নিরাপদ। তাই আগে থেকে কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা ক্লিনিকে প্রসব করাবে তা নির্ধারণ করতে হবে।
- যদি তা সম্ভব না হয় তবে বাড়ীতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রী দ্বারা প্রসব করাতে হবে। তাই প্রসবের জন্য একজন প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীর ও প্রশিক্ষিত ধাত্রীর সাথে যোগাযোগ করতে হবে।
- জরুরি মুহূর্তে দ্রুত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাবার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- ২/৩ জন রক্তদাতা ঠিক করে রাখতে হবে।
- বাড়ীতে প্রসব হলে প্রসব সরঞ্জাম যেমন, পরিষ্কার সুঁই-সুতা, সাবান, শুকনা সূতি কাপড়/তোয়ালে, ব্যান্ডেজ, ক্লিপ সংগ্রহ করে রাখতে হবে।
- প্রসবকালীন সময়ে যেকোনো জটিলতা দেখা দিলে অতি দ্রুত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে।

প্রতিটি প্রসবই করতে হবে নিরাপদ

৩. প্রসব-পরবর্তী যত্ন

- প্রসূতি মাকে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে।
- মায়ের এবং শিশুর সুস্থতার জন্য মাকে বেশি পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে।
- প্রসবের পরে মায়ের শরীর খুব ক্লান্ত থাকে, তাই পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশ্রাম নিতে হবে।
- প্রতিদিন গোসল করতে হবে এবং রোদে শুকানো পরিষ্কার কাপড় পরতে হবে।
- শিশুকে সঠিক নিয়মে বুকের দুধ খাওয়াতে হবে।
- প্রতিদিন হালকা ব্যায়াম বা কিছু সময় হাঁটাহাঁটি করতে হবে, তাহলে শরীর সুস্থ বোধ হবে, আরাম লাগবে।

প্রসব-পরবর্তী ৬ সপ্তাহ প্রসূতি মায়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়ে প্রসূতি মায়ের বিশেষ যত্ন নিতে হবে।

বিলম্বিত বা বাধাগ্রস্থ প্রসব, প্রসবজনিত ফিস্টুলার মূল কারণ। বিলম্বিত ও বাধাগ্রস্থ প্রসবের কারণে প্রসবকালে বাচ্চার মাথা যদি প্রসবপথে দীর্ঘক্ষণ আটকে থাকে তাহলে মূত্রনালী, প্রসাবের পথ এবং পায়ুপথের নরম অংশে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে পচন ধরে, ফলস্বরূপ ছিদ্র হয়ে প্রসবজনিত ফিস্টুলা সৃষ্টি হয়, এর ফলে অনবরত প্রসাব বা পায়খানা ঝরতে থাকে। কম বয়সী মায়েদের শরীর সন্তান ধারণ ও জন্মদানের উপযুক্ত হয় না। তাই কম বয়সী মায়েদের বিলম্বিত ও বাধাগ্রস্থ প্রসবের ঝুঁকি বেশি। তাই তাদের প্রসবজনিত ফিস্টুলা হবার ঝুঁকিও বেশি।

প্রসবজনিত ফিস্টুলা প্রতিরোধের উপায়-

- ১৮ বছর বয়সের আগে বিয়ে নয়, ২০ বছরের আগে গর্ভধারণ নয়।
- ঘনঘন গর্ভধারণ নয়।
- নিয়মিত প্রসব-পূর্ব স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা।
- বিলম্বিত ও বাধাগ্রস্থ প্রসব হলে গর্ভবতীকে দ্রুত নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া।
- জরুরি প্রসূতিসেবা নিশ্চিত করা।
- দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য সেবাদানকারী দিয়ে নিরাপদ প্রসব করানো।

চিকিৎসায় ফিস্টুলা ভাল হয়-

- প্রসবজনিত ফিস্টুলা হলে তা নিয়ে ভয়ের কিছু নেই। চিকিৎসায় প্রসবজনিত ফিস্টুলা ভাল হয়।

ফিস্টুলা রোগীর প্রতি কোনো অবহেলা নয় বরং যত দ্রুত সম্ভব তাকে কাছের হাসপাতালে পরামর্শ ও চিকিৎসা সেবার জন্য নিতে হবে।

১০. পরিবার পরিকল্পনা

পরিবার পরিকল্পনা কী

জীবনকে সুখী ও সুন্দর করার লক্ষে স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে চিন্তাভাবনা করে পরিকল্পিতভাবে পরিবার গঠন করাই হচ্ছে পরিবার পরিকল্পনা। সন্তান নেবার আগে স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে চিন্তা করবে তারা কখন সন্তান নিতে চায় এবং সন্তান নেবার জন্য প্রয়োজনীয় শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক প্রস্তুতি তাদের আছে কিনা।

পরিবার পরিকল্পনা কেন প্রয়োজন

- মা ও শিশুমৃত্যু হার কমানো যায়।
- মা ও শিশুর স্বাস্থ্য ভালো রাখা যায়।
- অনাকাঙ্খিত গর্ভধারণ রোধ করা যায়।
- পরিকল্পিতভাবে সুবিধাজনক সময়ে স্বামী-স্ত্রী সন্তান নিতে পারে।
- সন্তান সংখ্যা কম থাকলে স্বল্প আয়েও আর্থিকভাবে সচ্ছল থাকা যায়।
- সন্তানকে পুষ্টিকর খাবার, প্রয়োজনীয় পোশাক ও শিক্ষা দেয়া যায়।
- পরিবারে শান্তি থাকে।
- এইচআইভি/এইডস্‌সহ যৌনরোগের সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করা যায়।

পরিবার পরিকল্পনা জীবনকে সুন্দর করে।

আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিসমূহঃ

আধুনিক অস্থায়ী ও স্থায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি

- কনডম (পুরুষদের জন্য প্রতি মিলনের সময়)
- খাবার বড়ি (মহিলাদের জন্য প্রতিদিন)
- ইন্‌জেকশন (মহিলাদের জন্য ৩ মাস মেয়াদী)
- ইমপ্ল্যান্ট (মহিলাদের জন্য ৩ ও ৫ বছর মেয়াদী)
- আইইউডি বা কপারটি (মহিলাদের জন্য ১০ বছর মেয়াদী)
- টিউবেকটমি (মহিলাদের জন্য স্থায়ী পদ্ধতি)
- এনএসভি বা নো-স্কালপেল্‌ ভ্যাসেকটমি (পুরুষদের জন্য স্থায়ী পদ্ধতি)

কনডম

খাবার বড়ি

ইন্‌জেকশন

ইমপ্ল্যান্ট

বাহুতে ইমপ্ল্যান্ট লাগানোর স্থান

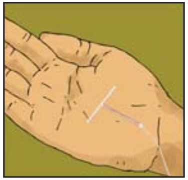
আইইউডি (কপারটি)

১১. প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রসমূহ

সেবা ও পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

- পরিবার কল্যাণ সহকারি
- স্যাটেলাইট ক্লিনিক
- কমিউনিটি ক্লিনিক
- ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র
- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
- মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র
- জেলা সদর হাসপাতাল
- মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
- মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, ঢাকা
- আজিমপুর মাতৃসদন ও শিশু স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, ঢাকা
- বিএসএমএমইউ মডেল ক্লিনিক, ঢাকা
- এনজিও ক্লিনিক
- বেসরকারি হাসপাতাল।